ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১২৩

৯ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩৪
ভাদ্র	১৪২০
সেপ্টেম্বর	২০১৩

বিনিময় : ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI ARTHABEBOSTHAR MULNITY. by Sayyed Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 15.00 Only

সূচীপত্র

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

আমাকে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আলোচনার পূর্বাহ্নেই আমি প্রশ্ন ক'টি আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাতে আমার আলোচনার পরিসর সম্পর্কে আপনারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ ইসলাম কি কোনো অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে? করে থাকলে তার খসড়া পেশ করুন। উপরন্তু ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন ঐ খসড়ায় কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে?

দুই ঃ যাকাত ও সাদকার অর্থ অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে কি?

তিন ঃ আমরা কি সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি?

চার ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোন্ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান?

প্রথম প্রশ্নের জবাব

এ প্রশ্নগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু সময় সংক্ষেপ হেতু এবং বিশেষ করে আজকের আলোচনা সভায় উচ্চশিক্ষিত সমাজের নিকট আমার বক্তব্য উপস্থাপনার কারণে এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই আমি যথেষ্ট মনে করছি।

প্রথম প্রশ্নের দু'টি অংশ। এক ঃ ইসলাম কি কোনো অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে? করে থাকলে তার খসড়া পেশ করুন। দুই ঃ ঐ খসড়ায় ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে? প্রশ্নের

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. ১৯৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে ইসলামের অর্থব্যবস্থার উপর এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। এ পুস্তিকাটি তারই হুবহু বাংলা অনুবাদ।

প্রথমাংশের জবাবে বলা যায়, ইসলাম অবশ্যই একটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে। তবে, ইসলাম প্রতি যুগের উপযোগী এমন একটি বিস্তারিত অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছে যেখানে অর্থনৈতিক বিধানের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত সমাধান দেয়া হয়েছে—এ অর্থে তা একটি অর্থনৈতিক বিধান নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম আমাদেরকে এমন কতগুলো মূলনীতি দিয়েছে যার ভিত্তিতে আমরা নিজেরাই প্রতি যুগের উপযোগী একটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করতে পারি। কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ইসলামের একটি রীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবনের প্রতিটি বিভাগের একটি চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দেয় এবং আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এই চতুঃসীমার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের জীবনের এ বিভাগটি গড়ে তোল। এর বাইরে তোমরা যেতে পার না। তবে এই চতুঃসীমার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের অবস্থা, প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিস্তারিত বিধান রচনা করতে পারো। ইসলাম এভাবেই ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্র থেকে শুরু করে সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল বিভাগে মানুষকে পথনির্দেশ দিয়েছে। পথনির্দেশের এই একই পদ্ধতি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও অবলম্বিত হয়েছে। এখানেও ইসলাম আমাদেরকে কতিপয় মূলনীতি ও চতুঃসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এরি মধ্যে অবস্থান করে আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো গঠনে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রত্যেক যুগ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিধান রচনার কাজ চালাতে হবে। অতীতে এভাবেই এ কাজ সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

ইসলামী ফিকাহ গ্রন্থগুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে, আমাদের ফকীহগণ এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থান করেই স্ব স্ব যুগের বিস্তারিত ও খুটিনাটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছিলেন। ফকীহগণ যে অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেন তা ইসলামের মূলনীতি থেকেই গৃহীত এবং ইসলাম নির্ধারিত চতুঃসীমার মধ্যে তার অবস্থান। ঐ খুঁটিনাটি বিধানগুলোর যে অংশ আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পূর্ণ করে তা আমরা হুবহু গ্রহণ করে নেব, আর এ ছাড়া আমাদের এখন যেসব নতুন প্রয়োজন ও সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোর জন্য আমরা নতুন বিধান রচনা করতে পারি। তবে সেসব বিধান অবশ্যই ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি থেকে গৃহীত হতে হবে এবং ইসলাম নির্ধারিত চতুঃসীমার (Four Corners) মধ্যেই সেগুলোকে অবস্থান করতে হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য

ইসলামের একটি অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে—একথার অর্থ এখন সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে যে মূলনীতি দিয়েছে তা বর্ণনা করার পূর্বে আমি ইসলামী অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives) আলোচনা করতে চাই। এই উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি অনুধাবন করা, অবস্থা ও প্রয়োজনের সাথে সেগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার যথার্থ প্রাণসত্তা অনুযায়ী বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধান রচনা সম্ভবপর নয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানব জাতির কল্যাণার্থে তার উপর যতটুকু বিধি-নিষেধ আরোপ করা অপরিহার্য কেবলমাত্র ততটুকু বিধি-নিষেধই তার উপর আরোপ করেছে। ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দান করেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এখানে সমষ্টিগত জবাবদিহির কোনো ধারণাই নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী এবং ব্যক্তিগতভাবেই তার নিজের কাজের জবাব দিতে হবে। এ জবাবদিহির জন্য মানুষের নিজস্ব ঝোঁক-প্রবণতা, যোগ্যতা ও নিজের ব্যক্তিগত নির্বাচন অনুযায়ী তার ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নের সর্বাধিক সুযোগ থাকতে হবে। এজন্য ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যেখানে ব্যক্তি মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপহৃত হয় সেখানে তার নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতারও বিলোপ সাধন হয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নিজের অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের মুখাপেক্ষী সে নিজস্ব কোনো স্বাধীন চিন্তা পোষণ করলেও তাকে কার্যকরী করার স্বাধীনতা তার থাকে না। এ কারণে ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে নীতি দান করে তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দান করা হয় এবং কেবলমাত্র যথার্থ মানবিক কল্যাণের স্বার্থে যে পরিমাণ বিধি-নিষেধ অপরিহার্য সে পরিমাণই তার উপর আরোপ করে। এজন্য ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণ মানুষের

স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, জনগণ নিজেদের ইচ্ছামত সরকার পরিবর্তন করতে পারবে। জনগণের বা তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। এ ব্যবস্থার সমালোচনা বা এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা জনগণের থাকবে। সরকার কোনো ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হবে না, বরং কুরআন ও সুন্নাহর উচ্চতর আইন ও বিধান তার জন্য ক্ষমতার যে সীমা নির্দেশ করেছে তার মধ্যে অবস্থান করেই সে কাজ করে যাবে। উপরন্তু ইসলামে আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণকে স্থায়ীভাবে মৌলিক মানবাধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এগুলো অপহরণ করার অধিকার কারোর নেই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও ব্যক্তি-সত্তার উন্নয়ন রোধকারী কোনো প্রকার নির্যাতন ও একনায়কত্বমূলক ব্যবস্থা যাতে করে তার উপর চেপে বসতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে।

নৈতিক সংশোধন—বল প্রয়োগ নয়

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইসলাম মানুষের নৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতিকে মৌলিক গুরুত্ব দান করে। এ উদ্দেশ্যে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি যাতে করে স্বাধীনভাবে সৎকর্ম করার সর্বাধিক সুযোগ লাভ করে তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এভাবে মানুষের জীবনে দয়া, প্রেম, বদান্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। তাই অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কেবলমাত্র আইন ও সংবিধানের উপর নির্ভর করে না। বরং এ ব্যাপারে ঈমান, ইবাদত, শিক্ষা ও নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের আভ্যন্তরীণ ও মানসিক সংস্কার সাধন, তার রুচি ও চিন্তা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তার মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, যার সাহায্যে সে নিজে ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও কার্যসিদ্ধ না হলে মুসলমানদের সমাজের অবশ্যই এতটুকু প্রাণশক্তি থাকতে হবে যার ফলে সামাজিক চাপের মুখে মানুষকে ইসলামী বিধি-বিধানের অনুগত রাখা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রমাণিত না হলে ইসলাম আইনের শক্তি ব্যবহার করে। এভাবে অবশেষে শক্তির সাহায্যে ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সমাজব্যবস্থা ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র আইনের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয় এবং মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে তাকে স্বেচ্ছায় ন্যায়ের পথে চলার শক্তি তিরোহিত করে, ইসলাম তাকে ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করে।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, ইসলাম মানবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারক নৈরাজ্য, দলাদলি ও সংঘর্ষের বিরোধী। তাই ইসলাম মানব সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত করে না এবং প্রকৃতিগতভাবে মানব সমাজে বিরাজিত শ্রেণীগুলোকে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার পথ দেখায়। মানব সমাজ বিশ্লেষণ করলে এখানে দু'ধরনের শ্রেণী দেখা যাবে। কৃত্রিমভাবে একটি নির্যাতনমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবৈধ ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এক ধরনের শ্রেণীর জন্ম দেয়, অতপর বলপূর্বক তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যেমন—ব্রাহ্মণ্যবাদ, জমিদারী ব্যবস্থা বা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেসব কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। ইসলাম নিজে এই ধরনের শ্রেণীর জন্ম দেয় না এবং এগুলো টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতীও নয়। বরং সামাজিক সংস্কার ও আইনগত পদ্ধতি অবলম্বন করে এগুলোর বিলোপ সাধন করে। প্রকৃতিগতভাবে মানবিক যোগ্যতা ও অবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় এক ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। ইসলাম বলপূর্বক এই ধরনের শ্রেণীগুলোর বিলোপ সাধন করে না এবং এগুলোকে স্থায়ী শ্রেণীর রূপ দানও করে না বা এদের পরস্পরকে শ্রেণী সংগ্রামেও লিপ্ত করে না। বরং ইসলামের নৈতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ সহযোগিতা সৃষ্টি করে, তাদেরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল পরস্পরে সাহায্যকারী ও সহযোগী বানায় এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে এ শ্রেণীগুলো স্বাভাবিকভাবেই একাত্ম ও পরিবর্তিত হতে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

এ তিনটি বিষয় দৃষ্টি সমক্ষে রাখার পরই এই অর্থব্যবস্থার মূলনীতির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর হবে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনার পর এবার আমি এর মূলনীতিগুলো বর্ণনায় প্রবৃত্ত হব।

ইসলাম কতিপয় বিশেষ সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দেয়। ব্যক্তিমালিকানার ব্যাপারে উৎপাদন-উপকরণসমূহ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে অথবা শ্রমার্জিত আয় ও বিনাশ্রমে অর্জিত আয়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করে না। ইসলাম মানুষকে মালিকানার সাধারণ অধিকার দান করে, তবে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলামে এমন কোনো ধারণা নেই যার ভিত্তিতে উৎপাদন-উপকরণসমূহ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে উৎপাদন-উপকরণসমূহে

ব্যক্তিমালিকানার আওতা বহির্ভূত এবং নিছক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে এর আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এক ব্যক্তি যেমন বস্ত্র, পাত্র ও গৃহের আসবাবপত্রের অধিকারী হতে পারে অনুরূপভাবে সে জমি, মেশিন ও কারখানারও অধিকার লাভ করতে পারে। এভাবে এক ব্যক্তি যেমন নিজের প্রত্যক্ষ শ্রমার্জিত অর্থ–সম্পদের বৈধ অধিকারী হয়, তেমনি সে নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিরও মালিক হতে পারে এবং ব্যবসায়ে অংশীদারীত্বের নীতির ভিত্তিতে সে এমন একটি উপার্জনের অংশীদার হতে পারে যা তার লগ্নীকৃত মূলধনকে ব্যবসায়ে খাটিয়ে অন্য এক ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করেছে। ইসলাম উৎপাদন-উপকরণসমূহকে মালিকানা বা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মালিকানা অথবা শ্রমার্জিত বা বিনা শ্রমে উপার্জিত অর্থের মালিকানা, এ দু'প্রকার মালিকানার মধ্যে পার্থক্য করে না, বরং ইসলামে পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে অর্থোপার্জনের উপায়সমূহের (Means) বৈধতা বা অবৈধতা অথবা অর্থ ব্যবহারের হারাম বা হালাল পদ্ধতি। ইসলাম সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের নীলনকশা এমনভাবে তৈরী করেছে যাতে মানুষ কতিপয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করতে পারে। ইতিপূর্বেই আমি বলেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সে মানবতার বিকাশ ও উন্নতির সমগ্র প্রাসাদ নির্মাণ করে। মানুষের ব্যক্তি-মালিকানা অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার পর অর্থনীতির সমগ্র উপায়-উপকরণের উপর সমষ্টির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করলে অনিবার্যভাবেই তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পর যে প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণসমূহের নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মচারীতে পরিণত হয়।

সমবণ্টন নয়—ইনসাফপূর্ণ বণ্টন

সম্পদের সমবণ্টনের (Equal Distribution) পরিবর্তে ইনসাফপূর্ণ বণ্টন (Equitable Distribution) ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি মূলনীতি। অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণসমূহ সমস্ত মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, আল্লাহর এ বিশ্বজাহানে কোথাও সমবণ্টন নীতি কার্যকর নেই। সমবণ্টন মূলত অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক। সমস্ত মানুষের স্মৃতি শক্তি কি সমান ? সমস্ত মানুষ কি সমান সৌন্দর্য, শক্তি ও

যোগ্যতাসম্পন্ন ? একই ধরনের পরিবেশ ও অবস্থায় কি সমস্ত মানুষের জন্ম হয় ? দুনিয়ায় কাজ করার জন্য সবাই কি একই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়। এসব ব্যাপারে এক্ষেত্রে সাম্য না থাকলে নিছক উৎপাদন উপকরণ-সমূহ ও অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যের অর্থ কি ? কার্যত এটা সম্ভব নয় এবং সেখানে কৃত্রিমভাবে এর প্রচেষ্টা চললে অনিবার্যভাবে তা ব্যর্থ হবে। উপরন্তু পরিণামেও দেখা দেবে মারাত্মক ভুল। এজন্যই ইসলাম অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণাদি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফলসমূহ সমবণ্টনের কথা বলে না। বরং ইসলাম ইনসাফপূর্ণ বন্টনের দাবিদার। এ ইনসাফের জন্য সে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করেছে।

উপার্জন উপকরণাদিতে হালাল-হারামের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম নীতি হচ্ছে, সম্পদ আহরণের উপকরণাদির মধ্যে ইসলাম হালাল ও হারামের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এক দিকে সে ব্যক্তিকে স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের অধিকার দান করে এবং অন্যদিকে অর্থোপার্জনের পদ্ধতিসমূহে হালাল ও হারামের সীমা নির্ধারণ করে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি হালাল পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্য সে নিজের ইচ্ছামত অর্থোপার্জনের যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং যে কোনো পরিমাণ অর্থ উপার্জনও করতে পারে। সে তার এই উপার্জিত অর্থে বৈধ মালিক বলে স্বীকৃত হবে। তার এই বৈধ মালিকানা সীমিত করার বা তার থেকে এর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। তবে হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার তার নেই। হারাম পদ্ধতি অবলম্বন থেকে তাকে বলপূর্বক বিরত রাখা হবে। এ পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থের সে বৈধ মালিক স্বীকৃত হবে না। তার অপরাধের পর্যায়ানুসারে তাকে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দেয়া যেতে পারে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও অবলম্বিত হবে।

ইসলামে যে সমস্ত পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণকে হারাম গণ্য করেছে সেগুলো হচ্ছে—আত্মসাৎ, ঘুষ, পরদ্রব্য গ্রাস, সরকারী কোষাগার থেকে আত্মসাৎ, চুরি, পরিমাপে কম করা, চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যবসায়, বেশ্যাবৃত্তি, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের শিল্প ও ব্যবসায়, সুদ, জুয়া, ধাপ্পাবাজী এবং ব্যবসায়ের এমন সমস্ত পদ্ধতি যেখানে প্রতারণা ও চাপ প্রয়োগের ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালিত হয় অথবা যেগুলোর মাধ্যমে

কলহ, বিশৃংখলা ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয় এবং যেগুলো ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও গণস্বার্থ বিরোধী। ইসলাম আইন প্রয়োগ করে এসব পদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ব্যবহার করার পথ রোধ করে। এছাড়াও ইসলাম মজুতদারী (Hoarding) নিষিদ্ধ গণ্য করে এবং যে ইজারাদারী কোনো প্রকার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই অর্থ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে সাধারণ লোকদের উপকৃত হবার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়—তার পথ রুদ্ধ করে।

এ পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণগুলো বাদ দিয়ে বৈধ উপায়ে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করে, তা হালাল উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। এ হালাল সম্পদ সে নিজে ভোগ করতে পারে। উপহার, দান বা অন্যবিধ পদ্ধতিতে অন্যের নিকট হস্তান্তরও করতে পারে। এমনকি অধিক সম্পদ আহরণের জন্যও ব্যবহার করতে পারে এবং নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য মীরাস হিসেবেও রেখে যেতে পারে। এই বৈধ উপার্জনের উপর এমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপিত নেই। যার সাহায্যে কোনো এক পর্যায়ে পৌঁছে তাকে আরো উপার্জন থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে কোটিপতি হয়ে গেলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে ইচ্ছামত উন্নতি লাভ করতে পারে, তবে এ উন্নতি তাকে বৈধ উপায়ে লাভ করতে হবে। অবশ্যই বৈধ উপায়ে কোটিপতি হওয়া সহজ সাধ্য নয়, এটা বিরল ঘটনা। কোনো অসাধারণ ব্যক্তি কখনো আল্লাহর এ অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। নচেৎ বৈধ উপায় অবলম্বন করে কোটিপতি হবার অবকাশ কমই থাকে। কিন্তু ইসলাম কাউকে বেঁধে রাখে না। হালাল উপায়ে সে যত অধিক সম্পদ চায় আহরণ করতে পারে। তার পথে কোনো বাঁধা নেই। কারণ অনর্থক বাঁধা-নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের কর্মপ্রেরণা (Incentive) খতম হয়ে যায়।

সম্পদ ব্যবহারে হালাল-হারামের পার্থক্য

এভাবে বৈধ ও হালাল উপায়ে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা ব্যবহারের উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এ সম্পদ মানুষ নিজের জন্য ব্যয় করতে পারে। এ ব্যয়কে ইসলাম এমনভাবে সংযত করে, যার ফলে তা মানুষের নিজের চরিত্র ও সমাজের জন্য কোনোক্রমেই ক্ষতিকর হতে পারে না। সে মদ্যপান করতে পারবে না। ব্যভিচার করতে পারবে না। জুয়াবাজীতে নিজের সম্পদ উড়িয়ে দিতে পারবে না। নৈতিকতা বিরোধী পন্থায় বিলাসব্যসনে ব্যয়

করতে পারবে না। সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। এমনকি বসবাসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জাকজমকের আশ্রয় নিলে তার উপর অবশ্যই বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এ সম্পদের কম-বেশী কোনো অংশ মানুষ সংরক্ষিত রাখতে পারে। ইসলাম এ প্রবণতা পছন্দ করে না। ইসলাম মানুষের অতিরিক্ত সম্পদ সংরক্ষিত রাখার পরিবর্তে বৈধ পদ্ধতিতে তাকে আবর্তিত করতে চায়। একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী ইসলাম এ সংরক্ষিত সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করে। ফলে এর একটা অংশ বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থে ও সামষ্টিক কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। কুরআন মজীদে যেসব কাজের সবচেয়ে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে ; মানুষের সম্পদ সংরক্ষণ প্রচেষ্টা তন্মধ্যে অন্যতম। কুরআন বলে ঃ 'যারা সোনা ও রূপা সংরক্ষণ করে, তাদের সংরক্ষিত সোনা ও রূপা জাহান্নামে তাদের দাগ দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে।' এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারের জন্য অর্থ-সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই একে আটকে রেখে মানুষের উপকারের পথ রুদ্ধ করার অধিকার কারোর নেই। বৈধ ও হালাল উপায়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করুন, নিজের প্রয়োজনে তা ব্যয় করুন। অতপর অবশিষ্ট যা থাকে বৈধ পদ্ধতিতে আবর্তন করাতে থাকুন।

এজন্য ইসলাম মজুতদারীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মজুতদারীর অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বাজারে না ছেড়ে গুদামে সংরক্ষণ করা, ফলে, বাজারে তার সরবরাহ কম হলে দাম বেড়ে যাবে। ইসলামী আইন এ ধরনের কাজকে হারাম গণ্য করে। কোনো ঘোরপ্যাঁচে না গিয়ে সোজাসুজি ব্যবসা চালাতে হবে। ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়যোগ্য পণ্য থাকলে এবং বাজারে তার চাহিদা থাকলে তা বিক্রি করতে অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জেনে বুঝে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাব সৃষ্টি করার জন্য তার বিক্রয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা মানুষ ব্যবসায়ীর পরিবর্তে ডাকাতে পরিণত করে।

এ কারণে ইসলাম অস্বাভাবিক ধরনের ইজারাদারীরও বিরোধী। কারণ এ ধরনের ইজারাদারী সাধারণ মানুষকে অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণাদি ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম অর্থোপার্জনের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে এক্ষেত্রে অন্যদের অগ্রসর হবার পথ রোধ করাকে কোনোক্রমেই বৈধ গণ্য করে না। সমষ্টিগত স্বার্থে যে ইজারাদারী একান্ত

অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র এ ধরনের ইজারাদারীর বৈধতা ইসলামে স্বীকৃত। অন্যথায় নীতিগতভাবে ইসলাম অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার এবং সবাইকে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাবার সমান সুযোগ দেয়ার পক্ষপাতী।

অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করে যদি কোনো ব্যক্তি আরও অর্থ উপার্জন করতে চায় তাহলে তাকে একমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য ইসলাম নির্ধারিত হালাল পদ্ধতিতেই তা করতে হবে। আমি ইতিপূর্বে অর্থোপার্জনের যেসব হারাম পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছি এ উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার

অতপর ইসলাম ব্যক্তির সম্পদের উপর সমষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। কুরআন মাজীদে নিকটাত্মীয়দের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের উপর তার নিজের ছাড়াও তার আত্মীয়-স্বজনদেরও অধিকার রয়েছে। সমাজের কোনো ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ উপার্জন করে তাহলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এ আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। কোনো জাতির অন্তর্গত এক একটি পরিবার যদি নিজেদের এ দায়িত্ব অনুভব করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতির অধিকাংশ পরিবারকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করে তাহলে বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যা হয়তো অতি অল্পই থেকে যাবে। এজন্যই কুরআন মজীদে বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম মা, বাপ ও আত্মীয়-স্বজনদের হকের উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন মানুষের সম্পদের উপর তার প্রতিবেশীদের অধিকারও আরোপ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পাড়ায় মহল্লায় অলি-গলিতে যাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল তাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পাড়া, মহল্লা ও গলির তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল লোকদের সহায়তা দান করতে হবে।

এই দ্বিবিধ দায়িত্বের পর কুরআন মজীদে প্রত্যেক সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা সাহায্য প্রার্থীকে নিজের সামর্থানুযায়ী সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করে।

"মানুষের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" যে ব্যক্তি আপনার নিকট সাহায্য-সহায়তা প্রার্থনা করে সে হচ্ছে প্রার্থী। যে দ্বারে দ্বারে ভিখ মেগে বেড়ায় এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তাকে প্রার্থী বলা যায় না। বরং যথার্থ প্রার্থী এমন এক ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে, যে সত্যিকার অভাবী এবং তার অভাব পূরণের জন্য আপনার দারস্থ হয়। কিন্তু সে যথার্থ অভাবী কিনা এ ব্যাপারে নিজের সকল প্রকার সন্দেহ নিরসনের জন্য তার অবস্থা জানার অধিকার আপনার রয়েছে। কিন্তু সে যথার্থ অভাবী—একথা আপনি যখন জানতে পারেন এবং তাকে সাহায্য দেয়ার মত প্রয়োজনাতিরিক্তি অর্থও যদি আপনার নিকট থাকে তাহলে জেনে রাখুন, আপনার ধন-সম্পদে তার অধিকার রয়ে গেছে। আর বঞ্চিত বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে আপনার নিকট সাহায্য চাইতে আসে না। কিন্তু সে নিজের আহার্য সংস্থান করতে বা পুরোপুরি সংস্থান করতে পারে না—একথা আপনি জানেন—তবে আপনার অর্থ-সম্পদে এহেন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে।

এ অধিকারগুলো ছাড়াও ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দান করে তাদের অর্থ-সম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকারও কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, অনুভূতিশীল ও মানব দরদী হতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতার পরিবর্তে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাকে প্রত্যেকটি সৎকাজের এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। এটি একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী নৈতিক ক্ষমতা। ইসলাম নিজের শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ইসলামী সমাজের সামষ্টিক পরিবেশের সাহায্যে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এই নৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি করতে চায়। এভাবে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সে সমাজকল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

যাকাত

এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যয় নির্বাহের পর ইসলাম আর একটি ব্যয়কে অপরিহার্য গণ্য করেছে। সেটি হচ্ছে যাকাত। সঞ্চিত ও সংরক্ষিত অর্থ, ব্যবসায় পণ্য, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়, কৃষিজাত দ্রব ও গবাদি পশুর উপর যাকাত ধার্য করা। এই যাকাতলব্ধ অর্থের সাহায্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর লোকদের সহায়তা দান করা হয়। এই দু'ধরনের ব্যয়কে নফল নামায ও ফরয নামাযের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নফল নামায যত

ইচ্ছা পড়তে পারেন। ইচ্ছামত আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারেন। যত বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চান তত বেশী নফল নামায পড়ুন। তবে ফরয নামায অবশ্যই পড়তে হবে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারটিও এই একই পর্যায়ভুক্ত। এক প্রকার ব্যয় নফল শ্রেণীভুক্ত—নিজের ইচ্ছামত তা করতে পারেন। কিন্তু অন্য প্রকার ব্যয় ফরযের অন্তর্ভুক্ত। একটি বিশেষ পরিমাণের অধিক অর্থের মালিক হলে এ ব্যয়টি করা আপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

যাকাত ও ট্যাক্সের পার্থক্য

যাকাত কোনো ট্যাক্স নয়। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। আসলে এটি একটি ইবাদত এবং নামাযের ন্যায় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ট্যাক্স মানুষের উপর জোরপূর্বক বসানো হয়। তাই মানুষ তাকে সানন্দে গ্রহণ করে নেবে এমন কোনো কথা নেই। ট্যাক্স ধার্যকারীদের কোনো ভক্ত-অনুরক্ত হয় না। তাদের কাজের সত্যতার উপর কেউ ঈমান আনে না। তাদের চাপানো এ বোঝাকে সবাই জোরপূর্বক আদায়কৃত জরিমানা মনে করে। এই ট্যাক্সের উপর তারা নাসিকা কুঞ্চন করে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা হাজারো বাহানা তালাশ করে। ট্যাক্স ফাকি দেয়ার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এর ফলে তাদের ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য সূচিত হয় না। এ ছাড়াও এ দুয়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, ট্যাক্সের সাহায্যে এমন সব ব্যয় নির্বাহ করা হয় যা থেকে ট্যাক্সদাতা নিজেও লাভবান হয়। ট্যাক্সের পিছনে যে মৌলিক চিন্তা কার্যকরী রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনি যেসব সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন বোধ করেন এবং সরকারের মাধ্যমে সেগুলো লাভ করার জন্য আপনার আর্থিক সামর্থানুযায়ী সরকারকে চাঁদা দিন। এ ট্যাক্স আসলে প্রার্থিত সামষ্টিক সুযোগ-সুবিধা দানের বিনিময়ে আপনার নিকট থেকে আইনের বলে গৃহিত এক ধরনের চাঁদার শামিল। এ সুযোগ-সুবিধার দ্বারা সমাজের অন্যদের ন্যায় আপনিও লাভবান হন। বিপরীতপক্ষে যাকাত নামাযের ন্যায় একটি ইবাদত মাত্র। কোনো পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ যাকাত ধার্য করে না। বরং আল্লাহ নিজেই ধার্য করেছেন—প্রত্যেক মুসলমান তাঁকে একমাত্র মাবুদ মনে করে। যে ব্যক্তি নিজের ঈমান সংরক্ষণ করতে চায় সে কখনো যাকাত ফাঁকি দেবার বা তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতে পারে না। বরং তার নিকট থেকে

হিসেব নেয়ার এবং যাকাত আদায় করার জন্য বাইরের কোনো শক্তি না থাকলেও সে নিজের মন ও ঈমানের তাগিদে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের সম্পদের যথাযথ হিসেব করে তার যাকাত বের করবে। উপরন্তু যে সমস্ত সামাজিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে আপনার স্বার্থ বিজড়িত এবং যেগুলো দ্বারা আপনি নিজেও লাভবান হন সেগুলো পূর্ণ করার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হয় না। বরং এমন সবলোকের জন্য এ যাকাত গ্রহণ করা হয় যারা কোনো না কোনোভাবে অর্থ বণ্টন ব্যবস্থায় নিজেদের অংশ পায়নি বা পূর্ণাঙ্গ রূপে পায়নি এবং কোনো কারণে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। এভাবে দেখা যায় প্রকৃতি, মূলনীতি, মৌলপ্রাণসত্তা ও আকার-আকৃতির দিক দিয়ে যাকাত ট্যাক্স থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। দেশের পথ-ঘাট ও রেল লাইন নির্মাণ, খাল খনন এবং আইন ও শাসন বিভাগ পরিচালনার জন্য এ অর্থ ব্যবহার করা হয় না। বরং কতিপয় বিশেষ হকদারের হক আদায় করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদত হিসেবে একে ফরয করা হয়েছে। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে প্রতিদান লাভ ছাড়া এর থেকে আপনি দুনিয়ায় আর কোনো প্রকার লাভবান হতে পারবেন না।

ট্যাক্স ধার্য করার ক্ষমতা

অনেকে এ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, ইসলামে যাকাত ও খারাজ ছাড়া কোনো প্রকার ট্যাক্স নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ স. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও আর একটি হক রয়েছে। আসলে ইসলামী শরীয়াত যে ট্যাক্সগুলোকে অবৈধ গণ্য করেছে সেগুলো হচ্ছে কাইসার ও কিসরা এবং রাজা-বাদশাহ ও আমীর উমরাহগণ কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স ; যেগুলোকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে নিয়েছিল এবং জনগণের সম্মুখে তার আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা নিজে দের দায়িত্ব মনে করতো না। তবে পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত সরকার জনগণের ইচ্ছা ও পরামর্শক্রমে যেসব ট্যাক্স ধার্য করে এবং এ খাতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারী তহবিলে জমা রাখে, জনগণের পরামর্শানুযায়ী তা ব্যয় করে এবং সরকার জনগণের সম্মুখে তার হিসেব দেয়ার ব্যাপারে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে, সেসব ট্যাক্স ধার্য করার উপর শরীয়ত অবশ্যই কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমাজে যদি কোনো প্রকার অস্বাভাবিক রকমের অর্থনৈতিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে

অথবা একদল লোক হারাম পদ্ধতিতে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইসলামী সরকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে ট্যাক্স বসিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে এবং অন্যান্য ইসলামী আইন প্রয়োগ করে সম্পদ স্তুপীকৃত হবার পথ রুদ্ধ করতে পারে। সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য শাসকগণকে এমন সব একনায়কতন্ত্রমূলক ক্ষমতা দান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যেসব ক্ষমতা লাভ করার পর কোনো এক পর্যায়ে তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় না। ফলে এক যুলুমের পরিবর্তে তদপেক্ষা ভয়াবহ যুলুমের প্রতিষ্ঠা হয়।

উত্তরাধিকার আইন

এ ছাড়াও ইসলামের একটি উত্তরাধিকার আইনও রয়েছে। কোনো ব্যক্তি কম-বেশী যে পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তি রেখে মারা যাক না কেন একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম পিতা, মাতা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা এ সম্পত্তির অধিকারী হয়। অতপর ভাই-বোনেরা হয় এর উত্তরাধিকারী এবং তাদের পর হয় নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কোনো পর্যায়ের কোনো উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায় তাহলে সমগ্র জাতিই তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার সম্পদ-সম্পত্তি বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ইসলাম এসব মূলনীতি ও চতুঃসীমা নির্ধারণ করেছে। এ চতুঃসীমার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে আপনারা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারেন। যুগ-সমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি যুগে একে বিস্তারিত রূপদান আমাদের নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবং যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে, তা হচ্ছে এই যে, আমরা অবশ্যই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় একটি লাগামহীন অর্থব্যবস্থার সমগ্র উপায়-উপকরণকে সমষ্টি তথা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারি না। আমাদেরকে একটি চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থান করে এমন একটি স্বাধীন ও মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে—যেখানে মানুষের নৈতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত থাকবে, সমষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষকে আইনের নিগড়ে বাঁধার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভূত হবে। ভ্রান্ত পদ্ধতিতে যেখানে অস্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগের অবকাশ থাকবে না

এবং স্বাভাবিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে কলহের পরিবর্তে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হবে। অর্থ উৎপাদনের যে সমস্ত উপায়-উপকরণকে ইসলাম হারাম গণ্য করেছে এ অর্থব্যবস্থায় সেসবই হারাম বিবেচিত হবে এবং যেগুলোকে ইসলাম বৈধ গণ্য করেছে একমাত্র সেগুলোই বৈধ থাকবে। বৈধ পদ্ধতিতে অর্জিত সমুদয় সম্পদের উপর ব্যক্তির ইসলাম প্রদত্ত মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃত হবে। সম্পদের উপর অবশ্যই যাকাত ধার্য করা হবে এবং যারা নেসাব পরিমাণ অর্থের অধিকারী তাদের নিকট থেকে অপরিহার্যরূপে এটা আদায় করা হবে। উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মীরাছ বণ্টন করা হবে। সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতা চালাবার পূর্ণ সুযোগ দান করা হবে। এমন কোনো ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে না যেখানে ব্যক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হবে এবং তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হবে। এ স্বাধীন ও অবাধ প্রতিযোগিতা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই যদি ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আইন সেখানে অনর্থক মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজনবোধ করবে না। কিন্তু যদি তারা ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে অথবা বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করে এবং অস্বাভাবিক ধরনের মজুতদারী প্রভৃতির পথ প্রশস্ত করতে থাকে তাহলে তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ হরণ করার ও স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য নয়, বরং নিছক ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং সীমাতিক্রম করার প্রবণতা রোধ করার জন্য আইন অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক কর্মী

এ পর্যন্তকার আলোচনায় প্রথম প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব শেষ হয়েছে। এবার ঐ প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় আসুন। এখানে বলা হয়েছে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন কোন্ ধরনের মর্যাদা লাভ করেছে ? এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানদান করার জন্য আমি আপনাদেরকে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রে বর্ণিত মুযারিয়াত (ভাগ চাষ) ও মুদারিবাত (অংশীদারভিত্তিক ব্যবসা) সংক্রান্ত আইনগুলো পাঠ করার পরামর্শ দিতে চাই। আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রে এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠনকে যে ধরনের অর্থনৈতিক উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামী ফিকাহর পুরাতন গ্রন্থসমূহ ঠিক ঐ ধরনে সেগুলো বিবৃত হয়নি এবং ঐ বিষয়বস্তুগুলোর উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থও রচিত হয়নি। ইসলামী ফিকাহর বিভিন্ন অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো

আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোর পরিভাষা ও বর্ণনাভংগীরও আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের পরিভাষা ও বর্ণনাভংগী থেকে আলাদা। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিভাষা ও বর্ণনাভংগীর দাস নয়, বরং অর্থনীতির আসল বিষয়বস্তু ও সমস্যাবলী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী সে অতি সহজেই ইসলামী ফিকাহর অর্থনৈতিক আলোচনার ধারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে মুযারিয়াত ও মুদারিবাত সম্পর্কে যেসব বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টিভংগী পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মুযারিয়াত বলতে এমন এক ধরনের কৃষি ব্যবস্থা বুঝায় যেখানে এক ব্যক্তি জমির মালিক এবং অন্য এক ব্যক্তি তাতে চাষাবাদ করে। এ জমির ফসল থেকে উভয়েই অংশ লাভ করে। আর মুদারাবাত বলতে এমন এক ধরনের ব্যবসায় বুঝায়, যেখানে এক ব্যক্তির পুঁজি নিয়ে অন্য ব্যক্তি ব্যবসায় চালায় এবং তার মুনাফায় উভয়ই অংশীদারী হয়। লেনদেনের এ সকল বিভাগে ইসলাম যেভাবে জমি ও ধনের মালিক এবং চাষী ও ব্যবসায়ীর অধিকার স্বীকার করেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, জমি ও শ্রম উভয়ই অর্থনৈতিক কর্মী এবং এ সাথে পুঁজি ও এর সাথে মানুষ নিজের যে শ্রম ও সাংগঠনিক যোগ্যতা যুক্ত করে এসবই অর্থনৈতিক কর্মরূপে স্বীকৃত। এসব কর্মী তাদের কর্মক্ষমতার মাধ্যমে মুনাফায় নিজেদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে। প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম এসব বিভিন্ন ধরনের কর্মীর মধ্যে অংশীদারীত্বের সম্পর্কের ব্যাপারটি প্রচলিত রীতির উপর ছেড়ে দেয়। কারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষ যদি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ইনসাফ করে তাহলে সেখানে আইনের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন থাকো না, কিন্তু যদি কোনো ব্যাপারে ইনসাফ না হয় তাহলে অবশ্যি ইনসাফের সীমা নির্ধারণ করা আইনের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে। যেমন মনে করুন, আমি জমির মালিক। আমার জমি এক কৃষককে বর্গা দিলাম বা আমার জমিতে এক কৃষককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিকাজে নিযুক্ত করলাম অথবা কাউকে জমি ঠিকে দিলাম এবং তার সাথে প্রচলিত রীতি অনুসারে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে আমার শর্ত স্থিরীকৃত হলো। এ ক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তবে যদি আমি ঐ কৃষকের সাথে বে-ইনসাফী করি তাহলে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হবে। দেশের সংবিধানে এ উদ্দেশ্যে কৃষি সংক্রান্ত ধারা সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ভাগ-চাষী, ভূমি শ্রমিক বা ভূমি মালিক কারো স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যতক্ষণ ধনের মালিক এবং ব্যবসায়ে পরিশ্রমকারী ও সংগঠনকারীর মধ্যে ন্যায়নীতি

সহকারে ব্যবসায়ীক চুক্তি সম্পাদিত হতে থাকবে এবং কেউ কারোর হক মারার চেষ্টা করবে না বা কারোর ওপর অত্যাচার করবে না ততক্ষণ আইন সেখানে হস্তক্ষপ করবে না। তবে এসব ব্যাপারে কোনো পক্ষ যদি কোনো প্রকার বে-ইনসাফী করে তাহলে সেক্ষেত্রে আইন কেবল হস্তক্ষেপ করার অধিকারীই হবে না ; পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন সবাই যাতে ব্যবসায়ের মুনাফার ন্যায়ানুগ অংশ লাভ করতে পারে সেজন্য ইনসাফপূর্ণ বিধি-বিধান প্রণয়ন তার দায়িত্ব বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব

দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, যাকাত ও সাদকাকে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় কিনা ? এর জবাবে বলা যায়, যাকাত ও সাদকার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধান। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, তা হচ্ছে এই যে, অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়ন বলতে যদি সারা দেশের ও সমগ্র জাতির কল্যাণ ও উন্নয়ন বুঝানো হয় তাহলে এ উদ্দেশ্যে যাকাত ও সাদকার ব্যবহার বৈধ নয়। যাকাতের ব্যবহার সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তি যাতে তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে—যাকাত মূলত সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। এছাড়াও যাকাতের সাহায্যে আমরা সমাজের এমন এক শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে পারি যারা অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবার যোগ্যতা রাখে না। যেমন, এতিম, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অক্ষম বা সাময়িকভাবে বেকার অথবা সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের স্বল্পতাহেতু যারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে পারছে না এবং সামান্য সাহায্য-সহায়তা লাভ করলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে বা যারা ঘটনাক্রমে কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ ধরনের লোকদের সাহায্য-সহায়তা দান করার জন্য যাকাত ধার্য করা হয়েছে। আর সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যাকাত ছাড়া অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব

তৃতীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে, আমরা কি সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি ?

এর জবাবে বলা যায়, অবশ্যই করতে পারি। ইতিপূর্বে কয়েক শ' বছর পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর আজ যদি আপনি অন্যের অন্ধ

অনুসৃতি ত্যাগ করে যথার্থই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন তাহলে এর প্রতিষ্ঠা মোটেই কঠিন হবে না। ইসলামের আগমনের পূর্বে অর্থব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের ন্যায় সূদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছিল। ইসলাম এ অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে এবং সুদকে হারাম গণ্য করে। প্রথম আরবে সুদ হারাম হয়। অতপর যেখানেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সেখানেই সুদ হারাম হতে থাকে। সমগ্র অর্থব্যবস্থা সুদ ছাড়াই চলতে থাকে। শত শত বছর ধরে এ অর্থব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানেও এর জীবনী শক্তির অভাবের কোনো কারণ দেখা যায় না। যদি আমাদের মধ্যে ইজতিহাদের শক্তি থাকে এবং আমরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হই ও এ সাথে যে বস্তুকে আল্লাহ্ হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আজ সুদের বিলোপসাধন করে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রচলন করতে পারি। আমার লেখা 'সুদ' নামক গ্রন্থে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই বলে আমি সেখানে দেখিয়েছি। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। পুঁজি নিয়ে যারা কারবারে খাটাচ্ছে ও পরিশ্রম করছে এবং সাংগঠনিক তৎপরতা ও কার্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে তারা মুনাফা অর্জনে সফল হোক বা না হোক সেদিকে দৃষ্টি না রেখে পুঁজির ঋণের আকারে কারবারে লগ্নি হবার ও একটি নির্ধারিত হারে মুনাফা অর্জন করার কোনো অধিকার নেই। সুদের আসল অনিষ্টকারিতা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের পুঁজি শিল্প-কারখানায়, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে বা কৃষিফার্মে ঋণ আকারে লগ্নি করে এবং পূর্বাহ্নেই তাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা স্থিরীকৃত করে নেয়। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ঐ পুঁজি লগ্নিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারবারে লাভ-লোকসানের বা লাভ হলে কি পরিমাণে হচ্ছে তার কোনো পরোয়াই করে না। সে কেবল বছরে বছরে বা মাসে মাসে নিজের নির্দিষ্ট হারে লাভ করেই যাবে এবং এ সাথে আসল ফিরিয়ে পাওয়ারও অধিকারী হবে। এটিই আমাদেরকে খতম করতে হবে। কোনো ব্যক্তিই এটিকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে পারে না। এর বৈধতার কোনো কারণ পেশ করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলাম যে নীতি পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আপনি যদি ঋণ দেন তাহলে ঋণের আকারেই তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার অধিকার আপনার থাকবে। আর যদি আপনি মুনাফা অর্জন করতে চান তাহলে সোজাসুজি আপনাকে কারবারের অংশীদার হতে হবে এবং সেভাবেই চুক্তি করতে হবে। নিজের পুঁজি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় যেখানেই লাগাতে চান এ শর্তে লাগান যে, তা থেকে

যে মুনাফা অর্জিত হবে একটি বিশেষ হারে তা আপনার ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় পরিচালনাকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে। এটিই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির দাবি এবং এভাবেই অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধি সম্ভব। সুদ-পদ্ধতি খতম করে এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটির প্রচলনের পথে বাধা কোথায় ? বর্তমানে যে পুঁজি ঋণ আকারে খাটানো হয় তা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে খাটালেই হবে। সুদের হিসেবের ন্যায় মুনাফার হিসেব কষতে হবে, এ ব্যাপারে কোনো কঠিন সমস্যা দেখা যায় না। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই। আমরা অন্ধ অনুসৃতিতেই অভ্যস্ত। পূর্ব থেকে যা চলে আসবে চোখ কান বন্ধ করে তা চালিয়ে যেতেই আমরা চাই। ইজতিহাদ করে ইসলাম বিধৃত মূলনীতির কোনো সুসামঞ্জস্য, বৈধ ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে আমরা প্রস্তুত নই। বেচারা আলেম ওলামাদের নিন্দা করা হয় যে, তারা তাকলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ করে—ইজতিহাদে প্রবৃত্ত নয়। অথচ তারা নিজেরাই (পাশ্চাত্য চিন্তার) অন্ধ অনুসরণ করে চলছে, ইজতিহাদে তারাও উদ্যোগী নয়। আমাদের রোগ এ মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত না হলে বহু পূর্বেই এ সমস্যার সমাধান হতো।

চতুর্থ প্রশ্নের জবাব

শেষ প্রশ্নে বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন্ পর্যায়ে সম্পর্ক রয়েছে ?

এর জবাবে বলা যায়, এ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক একটি গাছের শিকড়, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্রের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি এখান থেকেই। ইবাদত বা প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় ব্যবস্থাও এখান থেকেই সৃষ্টি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত ব্যবস্থার উৎসও এখানেই। এরা সবাই একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদি আপনি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকেন তাহলে অনিবার্যভাবে ইসলাম প্রদত্ত নৈতিক আদর্শ ও নীতি অবলম্বন করতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত নীতির ভিত্তিতে আপনাকে সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে, ইসলামী নীতির ভিত্তিতে অর্থনীতির সমগ্র ব্যবস্থাপনার পরিচালনা করতে হবে। যে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনি নামায পড়েন ঐ একই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনাকে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হবে। যে দীনের বিধি-বিধান আপনার রোযা ও হজ্জ নিয়ন্ত্রণ করে ঐ একই দীনের বিধি-বিধান আদালত ও

বাজারের জীবনও নিয়ন্ত্রণ করবে। ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলো পৃথক এককের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো একই ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা মাত্র। এগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত এবং প্রত্যেকটি অন্যটির সাহায্যে শক্তিশালি। যেখানে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের অস্তিত্ব না থাকে এবং এ উৎসগুলো থেকে উৎসারিত নৈতিক বৃত্তি অনুপস্থিত থাকে সেখানে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং কোনোক্রমে প্রতিষ্ঠিত করলেও তা টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একই কথা। আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ও কুরআনের প্রতি ঈমান না থাকলে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। কারণ ইসলাম যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা দান করেছে তার ভিত্তি হচ্ছে ঃ আল্লাহ আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক, রাসূল তাঁর প্রতিনিধি, কুরআন তাঁর অবশ্য পালনীয় ফরমান এবং আমাদেরকে একদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে আমাদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন কোনো পৃথক এককের অধিকারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে বা ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থা থেকে সম্পর্কহীন থাকতে পারে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি ইসলামকে জেনে বুঝে গ্রহণ করেছে সে কখনো এ ধারণাই পোষণ করতে পারে না যে, মুসলমান থাকা অবস্থায় তার রাজ নীতি, অর্থনীতি বা তার জীবনের কোনো বিভাগ তার ধর্ম থেকে আলাদা থাকতে পারে। সে জানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন আদালতের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে আলাদা থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেবলমাত্র 'ধর্মীয়' ব্যাপারে ইসলামের আনুগত্য করার নাম ইসলামী জীবন হতে পারে না।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন
  - মুফতী মুহাম্মাদ শফী
- যাকাতের ব্যবহারিক বিধান
  - এ.জি. এম. বদরুদ্দোজা
- যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি
  - মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ
- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
  -মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলাম পরিচয়
  -ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
  -মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
  -মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
  -মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী